ইকবাল : সত্যসন্ধানের কবি

লেখকের ভূমিকা

প্রাপ্তিযোগ্যতার বাইরেও যা কিছু প্রাপ্তি, একমাত্র আল্লাহরই অনুগ্রহ। তাঁর জন্যই সমর্পিত আমার ও আমাদের সকল কৃতি ও প্রাপ্তি।

ভালোবাসার দাবি যদিও পূরণ করতে পারি না, তবুও ভালোবাসি তাঁকে; ভালোবাসি বলতেও ভালোবাসি। পরমপ্রিয় নবীর নগণ্য উম্মত হিসেবে দিলঢালা দরুদ তাঁর জন্য। শান্তির ফল্গুধারা বয়ে যাক তাঁর পরিবারের ওপরও।

সচেতন সাহিত্যচর্চার আগেও, পরে তো অবশ্যই; ইকবালের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল, আবেগ ছিল। নিটোল ভালোবাসাও যে ছিল তাঁর প্রতি– সেটা যদিও অনেকটা দাবিই মনে হচ্ছে; কিন্তু ভালোবাসা যে বাস্তবেই ছিল, তার উষ্ণ অনুভূতি এখনও হৃদয়ে জাগ্রত, জীবন্ত।

ভালোবাসার ব্যক্তি ও কবিকে চর্চা করাই স্বাভাবিক, এবং তা চলেছেও মোটামুটি; যদিও তাঁকে যথাযথ চর্চা করার পথ, পরিবেশ ও উপাদান ছিল নিতান্তই দুর্গম, অনুপযোগী; এখনও তাই।

ইকবালের কবিতার সাথে আমার পরিচয়, বলা দরকার কবিতার সুরের সাথে পরিচয়, সেই চটপটে কাঁচা শৈশব থেকে। ধর্মীয় মাহফিলে বক্তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত কবিতার সুর আমার হৃদয়ে রিনিঝিনি বাজত, দিলকে দুলিয়ে দিত। তখন অর্থ-মর্ম কিছুই বুঝতাম না। যখন থেকে কিছুটা হলেও অর্থ বুঝতে শুরু করি, তখন থেকে তাঁর কবিতার প্রতি মদির হয়ে উঠি। আরেকটু এগিয়ে, যখন উম্মাহ নিয়ে তার দিলের 'ধরকন' ও কবিতার দর্শন বোঝার চেষ্টা করি, তখন থেকে ভালো করে বুঝে নিয়েছি, তাঁকে আমাদের লাগবে, আমার আরও বেশি লাগবে– অনেক অনেক প্রয়োজনে; বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর মানসকর্ষণের দীক্ষার তাগিদে।

এর পর অন্য পর্ব। চর্চা, সাধনা পরিচর্যা। তারও পরে মাথায় ঘাম ছুটিয়ে লেখালেখি করা; চর্চার সঠিক ঠিকানা খোঁজা; অবিমিশ্র বিশ্বাসের বাতিঘরে আলোর জন্য প্রবেশ করা; এবং আরও অনেক কিছু...।

সর্বপ্লাবী নৈরাজ্যের উত্তরণজটিল সময়ক্ষণে আমি এবং আমরা ইকবালের কবিতায় কী পেয়েছি, সেটা সংক্ষেপে বলা সহজ নয়। তাঁর প্রতিটি কবিতাকে, প্রতিটি ছত্রকে শান্তি, সাম্য ও

বিশ্বকল্যাণচেতনার 'বিপ্লবপত্র' বললে বেশি বলা হয় না। আধুনিক সভ্যতার দ্বন্দ্বজটিল পথপরিক্রমায় বহির্সত্য ও অন্তর্সত্যের শিল্পময় বিন্যাস ঘটিয়ে যেভাবে তিনি পুরো বিশ্বকে কাব্যিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তা এককথায় বিরল প্রতীচ্যে।

এ কথাগুলো ঠিক নিজে যেভাবে জেনেছি-ভেবেছি, সেভাবে অপরকেও জানাবার প্রচণ্ড এক তাগাদা সৃষ্টি হয় অন্তরে। ওই সময় আমি প্রতিষ্ঠিতি কিছু জার্নাল ও দৈনিকে নিয়মিতই লিখছি। ইকবালকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো সে সময়েরই। রচনাকাল ২০১০ থেকে ২০১৪। একটি প্রবন্ধ– শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া : বিশ্বাসী কবিতার বিস্ফোরণ– ছাড়া অন্য সব প্রবন্ধই ওই সময়কার। (কৌতূহলবশত *মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ হাসসান* নামেও লেখা হয়েছে কিছু প্রবন্ধ।)

ছড়ানো প্রবন্ধগুলোকে জড়ানোর সুযোগ হলো পরিপূরক পরিবারের ভালোবাসায়। আনন্দ লাগছে এই ভেবে যে, আমার উত্তাপিত হৃদয়সুরে সুর মেলাবার লোক পাওয়া গেছে। আবার বিব্রতও কিছুটা। না জানি, দিনশেষে কত পস্তাতে হয় তাদেরকে। কারণ, 'উদ্ভট গল্পবাজি'র এ গরল যুগে এসব লেখাজোখা 'চিবুবার' মানুষ পাওয়া মুশকিল। কিন্তু শিল্পমনা রুচিবান প্রকাশকরা এসবে চুপসে যান না– এই ভেবে ভরসা পাই, পুলকিত হই।

দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা প্রকাশক-পরিবারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উভয় জগতের কল্যাণ দান করুন।

–মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম
১৯ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

ইকবালের মৃত্যুতে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা পূরণ হইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। আমাদের সাহিত্যজীবনে ইহা এক মারাত্মক আঘাত। জগতে আজ ভারতের স্থান অতি সংকীর্ণ, এই সময়ে ইকবালের মতো একজন কবিকে হারানো তাহার পক্ষে খুবই কষ্টের কথা। কারণ ইকবালের কবিতার একটা বিশ্বজনীন মূল্য ছিল।

—রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তি প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ৮ বৈশাখ ১৩৪৫

মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইকবালকে দেখার মধ্যে বা ইকবালের মহত্ত্বের দিকে না-তাকানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, নেই কোনো গৌরব। ভারতবর্ষের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন আমাদের গৌরব করার মতো তেমন কিছু ছিল না, সেই সময় আমরা পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ আর ইকবালকে। তাই রবীন্দ্রনাথকে আমরা যেমন বিবেচনা করি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তেমনই ইকবালকেও বিবেচনা করা উচিত আমাদের। বাঙালিত্বের সম্পন্নতার জন্য রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য হলে ইকবালও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ, রবীন্দ্রনাথ মানবতাকে যেমন অন্বেষণ করেছেন উপনিষদে, তেমনই ইকবাল অন্বেষণ করেছেন কোরানে; দুইই বাঙালিত্বের চেতনায় লীন।

—আহমাদ মাযহার

লেখক, গবেষক

সূচীপত্র

একবিংশ শতাব্দী ও কবি ইকবাল / ১১

রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল
একই সময়ের উত্তরাধিকার / ২০

ইকবালের দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা / ২৭

শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া
বিশ্বাসী কবিতার বিস্ফোরণ / ৩৭

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার
প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল / ৪৭

কুরআন ও ইকবাল / ৫৫

ইকবালের কাব্যে কুরআনি আয়াত
চিন্তা ও শব্দের কান্তিময় মানিকজোড় / ৬৯

সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদবি
ইকবালের চিন্তা ও শিল্পের মর্ম-অভিসারী / ৮৮

ইকবালকাব্যের অনুবাদে
ফররুখের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য / ৯৯

বাংলাদেশে ইকবাল-চর্চা / ১০৫

ইকবালের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি / ১১০

একবিংশ শতাব্দী ও কবি ইকবাল

সত্য সত্যই। সত্যকে অসত্যের আড়ালে ঢেকে রাখা যায় না। সত্য স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ং উজ্জ্বল। আঁধারির পর্দা চিরে সত্য উদ্ভাসিত হবেই প্রভাতের আলোর মিছিলে যোগ দিতে। দাপুটে দম্ভ নিয়ে অহেতুক দাপিয়ে বেড়াবার মানস নেই সত্যের। সত্যকে সেজদা করে পৃথিবীর সবকিছু– এমনকি যারা সত্যের টুঁটি চেপে ধরতে চায়, তারাও– স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। সত্যকে স্বীকার করলে সত্যের কিছু আসে যায় না, আসে-যায় তাদেরই, যারা সত্যকে স্বীকার করে। যারা অস্বীকার করে প্রকৃত সত্যকে, তারা আখেরে পস্তায়, লজ্জা পায়।

সময়ের চাকা যতই সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ততই মহাকবি ইকবালের প্রয়োজনীয়তা, প্রাসঙ্গিকতা, বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে তাঁর কাব্য-দর্শনের অপরিহার্যতা ও তাঁর দিগন্তাতীত জনপ্রিয়তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠছে। অমানিশার ঘোরান্ধ পর্দা চিরে, শক্ত পাথুরে আবরণ ছেদ করে ইকবালের খ্যাতি-চারা এখন মহা বটবৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর এই সমাধাজটিল সংকটকালে তাই বিশ্বজুড়ে ইকবাল-মূল্যায়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে, আবিষ্কৃত হচ্ছে তাঁর জনপ্রিয়তার স্বর্ণ-সুন্দর তত্ত্ব-রহস্য।

গবেষকদের ধারণা, বিংশ শতাব্দী যেমন ইকবাল-চিন্তার দিগন্তব্যাপ্তিময় প্রচারের শতাব্দী প্রমাণিত হয়েছে, তেমনই একবিংশ শতাব্দী ইকবালের নিখাদ জনপ্রিয়তার শতাব্দী প্রমাণিত হতে চলেছে। ইকবালের চিন্তা ও কল্পনা এতই শক্তি ও গতিময় ছিল যে, তিনি শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে পরিভ্রমণ করেছেন প্রতিভার ডানায় চড়ে। আজকের বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সেই ১৯৩৮-এর পূর্বেই বলেছিলেন, 'যদি চাই আমি চিত্র আঁকিব, শব্দের পর শব্দ থরে থরে সাজিয়ে/কিন্তু আসন্ন সংকটচিত্র কল্পনার চেয়েও বহুধাপ এগিয়ে।' অন্যত্র লিখেছেন, 'যে সংকটের পরিকল্পনা এখনো চলছে আকাশের পর্দায়/প্রতিচিত্র তার উজ্জ্বল হয়ে আছে আমারি বোধির আয়নায়।'

কিন্তু সন্দেহ নেই, একসময় ইকবালের কপালে জুটেছিল 'সাম্প্রদায়িক', 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'মুসলমানদের কবি', 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' ইত্যাদি রকমারি তকমা। এখন বেঁচে থাকলে হয়তোবা তাঁর নামের সঙ্গেও জুড়ে দেওয়া হতো 'জঙ্গি কবি', 'চরমপন্থী', 'গোঁড়া', 'মৌলবাদী' ও 'ধর্মান্ধ'র মতো বিভিন্ন খেতাব। কিন্তু সত্য তো সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল। ঘোর নিশির অমানিশা ভেদ করে তা

রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল

একই সময়ের উত্তরাধিকার

এক

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮)। রবীন্দ্রনাথের সতেরো বছর পর ইকবালের জন্ম, এবং তিন বছর আগে মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন সুদীর্ঘ আশি বছর জীবন। আর ইকবাল পেয়েছিলেন একষট্টি বছর জীবন।

প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে, পৃথিবীর প্রত্যন্ত জনপদে– যেখানে কথা আছে, কবিতা আছে, সাহিত্যের চর্চা আছে; সাহিত্যিকদের আলোচনা আছে– সেখানেই রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল দুটি অতিপরিচিত নাম। দুজনই কালোত্তীর্ণ ও কালজয়ী কবি। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ এবং উর্দু কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইকবালের আবির্ভাব ছিল সত্যিই এক যুগান্তর। বয়সের কিছু ব্যবধান থাকলেও দুজনই ভারতের দুই বড় সমসাময়িক কবি, যাদের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল একই সময়ে ও একই সমাজে। কবি-পরিচয়ের বাইরেও রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও দুজনই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একই সঙ্গে আবির্ভূত হন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ' *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে (কারো কারো মতে প্রথম কবিতা 'ভারতভূমি' *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৭৪)। এদিকে ১৮৯৬ সালে ছাত্রাবস্থায় সিয়ালকোটের কবিতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর ইকবালের মন কাব্যচর্চার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এবং তা দ্রুত বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। ১৯০১ সালে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু পত্রিকা *'মাখজান'*-এ প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত কবিতা *'হুমালাহ'* (হিমালয়)। এখান থেকেই তাঁর সরব ও সুরব কবিযাত্রা শুরু।

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ জন্মের মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করেন। আর ইকবাল শুরু করেন বিশ বছর বয়সে। ইকবালের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া নিয়মিত চলছিল বলে, কবিত্বশক্তির উপচেপড়া ঢেউ হৃদয়ে ধারণ করেও তাড়াতাড়ি কবিতা-লেখায় হাত দিতে পারেন নি।

সৃষ্টির সংখ্যাধিক্যে দুজনের মাঝে ব্যবধান লক্ষণীয়। কথাসাহিত্য, নাটকরচনা ও চিত্রশিল্পের অঙ্গনে ইকবালের উপস্থিতি নেই। এবং সেই হিসেবে সাহিত্যাঙ্গনে বহুপ্রজতার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহু এগিয়ে। তবে বিরলপ্রজতা,

অসাধারণ সৃষ্টিপ্রতিভা ও খ্যাতির দিক দিয়ে (নোবেলপ্রাপ্তি বাদ দিয়ে) দুজনই সমানে সমান। এছাড়াও অন্যান্য গুণাবলি ছাপিয়ে মূলত কবি হিসেবেই দুজনের প্রতিভা ও কাব্যপ্রভা বিশ্বময় স্বীকৃত ও আলোকিত। উভয়ের সাহিত্য ছিল শিল্পমানে শিখরস্পর্শী; দুইজনেই পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ কবির শিরোপা।

এছাড়াও, স্বদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে দুজনই ছড়িয়ে পড়েন বিশ্বের বিস্তৃত পরিসরে –স্বমহিমায়, স্বগৌরবে। এ-ক্ষেত্রে আবার দুজনের মাঝে ব্যবধান সূচিত হয়। রবীন্দ্রজীবনী ঘাঁটলে দেখা যায়, ইউরোপে রবীন্দ্রচর্চা শুরু হয় মূলত ১৯১২ সালে। তখন থেকেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। তাঁর প্রতি ইউরোপীদের কৌতূহল ও মুগ্ধতার প্রেক্ষিতে তাঁর গল্প-কবিতা-নাটকের অনুবাদ হয় তাদের ভাষা ও সাহিত্যে। এরই সিঁড়ি বেয়ে তিনি পা রাখেন নোবেল প্রাপ্তির সোনালি প্রান্তরে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইকবালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের প্রবাস-জীবনে (১৯০৫-১৯০৮)। রবীন্দ্রের প্রায় সাত বছর আগে। কারণ, জার্মানি ও লন্ডনে তাঁর অবস্থানকালে সেখানকার লেখক-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী-গবেষকদের কাছে বিপুলভাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। জার্মানির ক্যান্টন হলে 'ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য' এবং 'মুসলিম তামাদ্দুনের মর্মকথা' প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ছয়টি বক্তৃতা পেশ করেন। বক্তৃতাগুলোর তত্ত্বগভীরতা ও কালোত্তীর্ণ যুক্তিপরিবেশনার ফলে এগুলোর সারাংশ প্রচারিত হয় জার্মানির দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলোতে। প্রাচ্য ভাষা ও কলাবিদ ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বিখ্যাত মনীষী ড. আর. এ. নিকলসন কর্তৃক 'আসরারে খুদি'-র অনুবাদ *Secrets of self* (১৯২০), Ges *The reconstruction of Religious Thought in Islam* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন থেকে প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্যের চিন্তা-জগতে আলোড়ন ও আন্দোলন সৃষ্টি হয়। তাঁর খুদিদর্শন পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও ভোগবাদী মানসে রোপিত করে এক নবতর জীবনবোধ। সূচিত করে এক দুর্দান্ত বিপ্লব। তাঁর মননশীল সাহিত্য গভীরভাবে রেখাপাত করে তাদের মননে-মর্মে।

দুই

একই ঘরানার নয়, তবু দুজনই একই সময়ের উত্তরাধিকার। প্রত্যেকটি যুগ নিজেরই প্রয়োজনে কোনো এক বড় কবিসত্তা জন্ম দেয়, যিনি মানবজাতিকে সঠিক পথে চলার দিশা দান করেন। এই সূত্রে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতের জন্য অসাধারণ গৌরবের বিষয় যে, সে একই সময় এমন দুজন কবি জন্ম দিলেন, যার একজন এশিয়াকে চেষ্টা-সাধনার প্রতি উদাত্ত আহ্বান করলেন– ইকবাল। আরেকজন ইউরোপকে শান্তি-শৃঙ্খলার-নিরাপত্তার ডাক দিয়ে গেছেন দরদি কণ্ঠে– রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের জন্য দুজনই গর্বের ধন। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল ভারতের এমন দুটি কণ্ঠ, যার প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হয়েছে বিশ্বময়। বিংশ শতাব্দীর সূচনা ছিল ভারতবাসীর জন্য বড়

শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া

বিশ্বাসী কবিতার বিস্ফোরণ

এক

শেকওয়া কী? অভিযোগ, আপত্তি, নালিশ।

কার বিরুদ্ধে? স্বয়ং স্রষ্টার বিরুদ্ধে। মারাত্মক কথা! নিশ্চয়। এ মারাত্মকতাই সেদিন মার্জিত করেছিল পুরো পৃথিবীর মুসলিম মানসকে। অনুধাবিতপূর্ব অনেক কিছুই শিখিয়েছিল কবিতাদ্বয়। কতিপয় অতলচিন্তামুক্তদের মস্তিষ্কে ঝালও ছিটিয়েছিল। হৈহৈ করে উঠেছিল অনেকে– মর্মগভীরে পৌঁছার আগেই।

কী মজার ব্যাপার! তাওহিদ-অনুধাবনের অতলান্ত ডুবুরি কবিতার কবিকে পেতে হলো 'কাফের' খেতাব। তিনি বুঝলেন, এ অতলাশ্রয়ী দর্শনচিন্তার চাষবাস এ ভূমিতে চলে না। পাতলা পালে হাওয়া ধরবে না তেমন। হিতে বিপরীত হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের। 'অভিযোগের জবাব' লিখতে হবে– জওয়াবে শেকওয়া; লিখলেন তিনি এক বছর পর।

কেমন ছিল সেই আকাশবিদারী অভিযোগ? কেমন অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠ চিরে বের হয়েছিল সে অনুযোগ-পঙক্তিমালা? দেখা যাক দুচারটি চরণ,

> হে আল্লাহ! এবার বন্ধুদের কিছু অনুযোগ শোনো
> নিত্য গুণগাহিয়েদের কিছু অভিযোগও শোনো।
> তুমি তো জানোই, এ পৃথিবীতে তোমার নাম নেবার কেউ ছিল কিনা?
> মুসলমানদের বাহুবলেই তুমি পরিচিতি লাভ করেছ এ ধরায়।
> তাওহিদের চিত্র হর দিলে বসিয়েছি আমরাই
> তরবারির তলে থেকে এ বাণী শুনিয়েছি আমরাই।

এ-রকম দীর্ঘ অভিযোগ-নামা। ৩১ স্তবকের দীর্ঘ কবিতা। প্রতিটি স্তবকে ছয়টি পঙক্তি করে মোট ১৮৬ পঙক্তি। ঝিনুকমালার মতো অভিনব সাজে তরে-তরে সাজানো।

যারা কবিতা বুঝে না, কবির হৃদয়-আকুতি বুঝে না; প্রেমিক হৃদয়ের মান-অভিমানের উপজীব্য যাদের অজানা, কবিতায় সুফি দৃষ্টিভঙ্গির নিগুঢ় রহস্য যাদের অনাস্বাদিত; তারা হৈচৈ তুললেন– ইকবাল পথচ্যুৎ; তিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে কণ্ঠ বাজিয়েছেন। ইকবাল ভালো করে ধরতে পারলেন, আল্লাহ-প্রেমের আনাড়িদের কাছে এমন প্রেমপ্লাবিত কবিতার আবেদন বোধগম্য নয়। তাদের

বোঝাতে হবে। রচনা করলেন 'জওয়াবে শেকওয়া'। তিনি মুসলিম জাতির দুঃখ-দুর্দশা ও সমগ্রপ্লাবী অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করলেন। জ্বালিয়ে দিলেন আরেক অনল শিহরণ।

তোমাদের হৃদয়ে অনুভূতি নেই, প্রচণ্ড দরদ ও জ্বালা নেই
তোমাদের কাছে মুহাম্মদ সা.-এর বাণীরও কোনো মর্যাদা নেই।
আজানের শুধু প্রথা আছে, বেলালি আজানের প্রাণ নেই
দর্শনচর্চাও টুকটাক আছে, গাজালির সেই বিপ্লবী পঠন নেই।
মসজিদগুলো শোকবাণী ছড়াচ্ছে, মুসল্লি নেই মুসল্লি নেই
মুসল্লি আছে, তবে হিজাজি গুণের কেউ তো নেই।
...
ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা যদি রক্ষা করতে পারো মুহাম্মদের সাথে
মাটির পৃথিবী কিইবা জিনিস! লওহে মাহফুজও তোমার হবে।

এ-রকম ৩৬ স্তবকের মোট ২১৬টি পঙক্তি দিয়ে রচিত 'জওয়াবে শেকওয়া'–অভিযোগের উত্তর বা কারণ। ৩১ স্তবকের অভিযোগ আর ৩৬ স্তবকের অভিযোগের জবাব– এখান থেকেও আমরা বুঝতে পারি, যার কাছে অভিযোগের চেয়ে অভিযোগের যৌক্তিক কারণ ও জবাব বেশি, তিনি অভিযোগ করতেই পারেন। মনে রাখা উচিত, অভিযোগের জবাবে তিনি শুধু মুসলমানদের ভুল ধরেন নি, তাদের মাঝে ফুলও ছড়িয়েছেন; তাদের বাগানে ফুলও ধরিয়েছেন।

দুই

আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিমানক্ষুব্ধ অভিযোগ করা, সে অভিযোগ দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রচার করা; এই ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর সূচনা ইকবালের শেকওয়া দিয়েই। অবশ্য, এর আগেও আরবি কবিতায় টুকটাক অভিযোগ-কবিতা পাওয়া যায়– নিতান্তই অঙ্গুলিমেয়। তবে সেসবের কোনো ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য নেই। এমনকি, শেকওয়ার পরেও কোনো উল্লেখযোগ্য কবি শেকওয়া-কাব্য লিখেছেন, এমন ইতিহাস আমাদের হাতে আসে নি।

সঙ্গত কারণেই ভাবতে হচ্ছে, ইকবাল কেন এ-রকম একটি কবিতা লেখার দুঃসাহস করলেন, যা লিখে তাকে মিশ্রপ্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে? এটা লিখতে কি তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন? উদ্ধত হয়েছেন? বাধ্য হয়েছেন? বিষয়টা আসলে কি?

বিষয়টি বুঝতে হলে ইকবালের কবি-মানসের বন্দরে নোঙর ফেলতে হবে; ইতিহাসের আশ্রয়ও নিতে হবে খানিকটা। ইকবালের সৃষ্টিশীল সময়পরিসর ৪০ বছর ব্যাপৃত। সে সময় তিন পর্বে পর্বায়িত। ইউরোপে যাওয়ার আগের রচনা (ছাত্র জীবন থেকে ১৯০৫)। ইউরোপে থাকাকালীন রচনা (১৯০৫-১৯০৮)।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল

প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে, পৃথিবীর প্রত্যন্ত জনপদে– যেখানে কথা আছে, কবিতা আছে, সাহিত্যের চর্চা আছে; সাহিত্যিকদের আলোচনা আছে– সেখানেই ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) ও রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) দুটি অতিপরিচিত নাম, উদ্দীপক সংগ্রাম।

দুজনই কালোত্তীর্ণ কবি নন শুধু, কালজয়ীও বটে। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ এবং উর্দু কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইকবালের আবির্ভাব ছিল সত্যিই এক যুগান্তর।

রবীন্দ্রজীবনী ঘাঁটলে দেখা যায়, ইউরোপে রবীন্দ্রচর্চা শুরু হয় মূলত ১৯১২ সালে। তখন থেকেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। তাঁর প্রতি ইউরোপীদের কৌতূহল ও মুগ্ধতার প্রেক্ষিতে তাঁর গল্প-কবিতা-নাটকের অনুবাদ হয় তাদের ভাষা ও সাহিত্যে। এরই সিঁড়ি বেয়ে তিনি পা রাখেন নোবেলপ্রাপ্তির সোনালি প্রান্তরে।

অন্যদিকে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইকবালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের প্রবাস-জীবনে (১৯০৫-১৯০৮)। রবীন্দ্রের প্রায় সাত বছর পূর্বে। কারণ, জার্মানি ও লন্ডনে তাঁর অবস্থানকালে সেখানকার লেখক-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী-গবেষকদের কাছে বিপুলভাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। জার্মানির ক্যান্টন হলে 'ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য' এবং 'মুসলিম তামাদ্দুনের মর্মকথা' প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ছয়টি বক্তৃতা পেশ করেন। বক্তৃতাগুলোর তত্ত্বগভীরতায় ও কালোত্তীর্ণ যুক্তিপরিবেশায় বিস্ময়াভিভূত হয়ে যান শত-শত ইংরেজ বুদ্ধিজীবী। বক্তৃতাগুলো তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এগুলোর সারাংশ প্রচারিত হয় জার্মানির দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলোতে। প্রফেসর টমাস আরনল্ডের ছাত্রত্ব তাঁর পরিচিতির পথ আরও সুগম করে তোলে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। সে-সময় প্রাচ্য কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মধ্যে ইকবালের সমাদর ও স্বীকৃতি সবার শীর্ষে স্থান পায়। ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের পর তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি (১৯০৭-১৯০৮)-তে প্রফেসর পদে সাময়িকভাবে নিয়োগ পান। লন্ডনে তাঁর থিসিস Development of Metaphysics in Persia (১৯০৮), প্রাচ্য ভাষা ও কলাবিদ ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর

বিখ্যাত মনীষী ড. আর. এ. নিকলসন কর্তৃক 'আসরারে খুদির' অনুবাদ Secrets of self (১৯২০), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন থেকে The reconstruction of Religious Thought in Islam প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্যের চিন্তা-জগতে আলোড়ন ও আন্দোলন সৃষ্টি হয়। তাঁর খুদিদর্শন পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও ভোগবাদী মানসে রোপিত করে এক নবতর জীবনবোধ। সূচিত করে এক দুর্দান্ত বিপ্লব। তাঁর মননশীল সাহিত্য গভীরভাবে রেখাপাত করে তাদের মর্মে-মননে।

কথাসাহিত্য, নাটকরচনা ও চিত্রশিল্পের অঙ্গনে ইকবালের উপস্থিতি নেই। এবং সেই হিসেবে সাহিত্যাঙ্গনে বহুপ্রজতার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটু এগিয়ে বটে; তবে বিরলপ্রজতার দিক দিয়ে দুজনই সমানতালে সমান। এছাড়াও অন্যান্য গুণাবলি ছাপিয়ে মূলত কবি হিসেবেই দুজনের প্রতিভা ও কাব্যপ্রভা বিশ্বময় স্বীকৃত ও আলোকিত। উভয়ের সাহিত্য ছিল শিল্পমানে শিখরস্পর্শী। দুইজনেই পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ কবির শিরোপা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আল্লামা ইকবাল ভারতের দুই বড় সমসাময়িক কবি। যাদের সুনাম-সুখ্যাতি একই সময়ে এবং একই সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। কবি-পরিচয়ের বাইরেও রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দুজনই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একই সাথে আবির্ভূত হয়েছেন। পাশ্চাত্যে তাদের সুখ্যাতি, তাদেরকে নিয়ে চর্চা ও পাশ্চাত্যজগতে তাদের কালজয়ী কাব্যের প্রভাব– এগুলির দিকে দেখলে শিল্পের মানে ও সময়ের পরিমাণে ইকবালকে অনেকটা এগিয়ে বলতে হয়। যা বিস্তারিভাবে বলার সুযোগ এখানে নেই। এছাড়াও তৎকালীন গবেষকদের মতে আল্লামা ইকবালের কাব্যজগৎ ঠাকুরের কাব্যজগৎ থেকে বহুবিশাল ও বিস্তৃত ছিল। উপরন্তু মরণোত্তর ইকবালের যে-স্বীকৃতি, পুরো পৃথিবীজুড়ে তাঁর যে-চর্চা এবং তাঁকে নিয়ে লেখালেখির যে-আধিক্য, তাতে প্রমাণিত হয় যে, আসলে সে-যুগে নোবেলের প্রকৃত হকদার ছিলেন আল্লামা ইকবাল। প্রকৃত কালজয়ী কবি প্রমাণ পেতে হলে আজ থেকে ৩১ বছর পূর্বের জরিপ শুনুন!

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাস। লাহোরে পাকিস্তান সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় ইকবালের জন্মশতবার্ষিকী। অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধে সোচ্চারভাবে বলা হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ইকবালকে নিয়ে যা লেখা হয়েছে এবং প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে ক্ষীণকায় ও বিশালকায় গ্রন্থ হিসাব করলেও দুই হাজারের ঊর্ধ্বে হবে। এছাড়া পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তৃতা তো অসংখ্য-অগণিত। ফলে ইকবাল ইংরেজের শেক্সপিয়র, ইটালির দান্তে ও ভারতের ঠাকুরকে ছাড়িয়ে গেছেন অনেক দূরে।

বিশ্বসাহিত্যের দিকে গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে, ইকবালসাহিত্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বিশ্বসাহিত্যে অনুপস্থিত বা দূরলক্ষ। ভারতের

কুরআন ও ইকবাল

এক

পৃথিবীতে একটি শব্দ, যা শুনলে বা উচ্চারণ করলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে আশরীর-মন জুড়িয়ে যায় আশ্চর্য এক শীতলতায়, তা হলো 'কুরআন'। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল গবেষকের ঐকমত্য হলো, বিবর্তন-বিকৃতির এই দুর্দান্ত জগতে একমাত্র কুরআন ছাড়া অন্যকোনো গ্রন্থ আর শুরুশেষ সংরক্ষিত নেই। পৃথিবীর বুকে কুরআনের সর্বপ্রথম যে-কপি তৈরি হয়েছিল, আজ চৌদ্দশ বছর পরের কোনো কপির সঙ্গে যদি তাকে তুলনা করে দেখা হয়, তা হলেও একটি বর্ণে বা একটি জের-জবরেও কোনো ক্ষুদ্রতম পরিবর্তন দেখাতে পারবে না। চীন দেশের কোনো হাফেজ যদি আফ্রিকার গহীন জঙ্গলে পড়ে থাকা কোনো হাফেজকে কুরআন শোনায় এবং সে পরীক্ষামূলক কোনো জের-জবরে ভুল করে, তা হলেও সে তৎক্ষণাৎ ভুল ধরে দিতে পারবে। এমন নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ও সংশয়রহিত সংরক্ষণের একমাত্র কারণ হলো, স্বয়ং কুরআন অবতীর্ণকারী সত্তাই তার সংরক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কুদরত-স্কন্দে তুলে নিয়েছেন। 'আমিই নাজিল করেছি কুরআন, আমিই তার হেফজতকারী শক্তিমান।'[৭]

কুরআন মাজিদের সঙ্গে ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮) সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধাশান্ত ও মমতাগভীর। আবহমান কাল থেকে মুসলিম জাতি যেমন কুরআনকে একমাত্র জীবনবিধান ও সকল সমস্যার সমাধান বলে বিশ্বাস করে আসছে, তেমনই ইকবালও তা দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি নিজের জীবনে, সৃষ্টিতে, কাব্যে ও দর্শনে তা বাস্তবায়ন করে দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কুরআনকে তিনি অসাধারণ ইজ্জত করতেন। ইকবালগবেষকদের মতে, বিশেষ করে সৈয়দ সুলাইমান নদবি (১৮৮৪-১৯৫৩) ও সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদবির (১৯১৪-২০০০) মতে ইকবালের কুরআন-ইহতিরাম ও কুরআন-তেলাওয়াতের 'কাইফিয়াত'[৮] ছিল অন্যরকম। আর এই অনন্য অবস্থা সৃষ্টির

---

[৭] সুরা হিজর, আয়াত : ৯

[৮] 'কাইফিয়াত শব্দটি মূলত আরবি, উর্দুতেও ব্যবহৃত হয়। শব্দটি এত ব্যঞ্জনামধুর যে, তার মধুরতা ও মাদকতাকে বাংলায় এক শব্দ দিয়ে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বড়জোর বলা যায়, অভ্যন্তরীণ অবস্থা, ঘোরাচ্ছন্নতা, আবেগাচ্ছন্ন অবস্থা। তবু আমার মনে হয়, এসব অনুবাদ দিয়ে আরবি শব্দটির মূলভাব ও ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠছে না।

ইকবালের কাব্যে কুরআনি আয়াত

চিন্তা ও শব্দের কান্তিময় মানিকজোড়

এক

ইকবাল তাঁর কীর্তি ও কর্মবহুল জীবনে মোট এগারোটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। সাতটি ফার্সিতে, চারটি উর্দুতে। তাঁর ফার্সি কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে : *আসরারে খুদি* (স্বকীয়তার রহস্য) ১৯১৫, *রুমুজে বেখুদি* (আত্মলোপের রহস্য) ১৯১৮, *পয়ামে মাশরিক* (প্রাচ্যের বাণী) ১৯২২, *জবুরে আজম* (আজমের জবুর) ১৯২৭, *জাবিদনামা* (অমরলিপি) ১৯৩২, *পসে চেহ বায়দ কর্দ* (পরে কী করা উচিত) ১৯৩৬ ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত *আরমুগানে হিজাজ* (হিজাজের উপহার) ১৯৩৮। আর উর্দু কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে : *বাংগে দেরা* (ঘণ্টাধ্বনি) ১৯২৪, *বালে জিবরিল* (জিবরাইলের ডানা) ১৯৩৫, *জরবে কালিম* (মুসার যষ্ঠির আঘাত) ১৯৩৬ ও মৃত্যোত্তর প্রকাশিত *আরমুগানে হিজাজ উর্দু* ১৯৩৮। এগারোটি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তিনি পনেরো হাজার চরণ উপহার দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে : নয় হাজার ফার্সিতে, আয় ছয় হাজার উর্দুতে।

কুরআন মাজিদের সঙ্গে ইকবালের সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধাশান্ত ও মমতাগভীর। আবহমান কাল থেকে মুসলিম জাতি যেমন কুরআনকে একমাত্র জীবনবিধান ও সকল সমস্যার সমাধান বলে বিশ্বাস করে আসছে, তেমনই ইকবালও তা দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি নিজের জীবনে, কাব্যে ও দর্শনে তা বাস্তবায়ন করে দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কুরআনকে তিনি অসাধারণ ইজ্জত করতেন। ইকবালগবেষকদের মতে, বিশেষ করে সৈয়দ সুলাইমান নদবি ও সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদবির মতে ইকবালের কুরআন-ইহতিরাম ও কুরআন-তেলাওয়াতের 'কাইফিয়াত' ছিল অন্যরকম। আর এই অনন্য অবস্থা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে কৈশোরে নিজের পিতার একটি নিষ্ঠাপূর্ণ নসিহত। পিতা তাকে নসিহত করেছিলেন, প্রিয় ছেলে! তুমি এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করো, যেন কুরআন তোমার ওপর নাজিল হচ্ছে। তাই তিনি ঘরে-বাইরে, পথে-প্রবাসে কুরআন মাজিদ সঙ্গে রাখতেন এবং পূর্ণ আগ্রহ ও উদ্যম নিয়ে তা তেলাওয়াত করতেন এবং গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতেন।

কুরআন সম্পর্কে ইকবালের চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুধু নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ নয়, বিশাল বিশাল গ্রন্থও রচিত হতে পারে। কারণ, এ

সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদবি

ইকবালের চিন্তা ও শিল্পের মর্ম-অভিসারী

বিংশ শতাব্দীর কিংবদন্তী পুরুষ আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদবি। তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা, বহুমুখী ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিত্বসত্তা 'ব্যক্তিদুর্ভিক্ষের' এই দুর্দিনেও নতুন কোনো পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়। সে সূর্যমনীষীর অমল আলোয় আলোকিত হয়েছে আরব ও আজমের সমুদয় জনপদ। পৃথিবী এমন কিছু ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে অভিভূত হয়েছে, যাদের গুণ-জ্ঞানের বর্ণনা, প্রজ্ঞা-প্রতিভার বন্দনা শব্দ-বাক্যের সীমানার ঊর্ধ্বে। আবুল হাসান আলি নদবি তাঁদেরই অন্যতম। সাগরসমান মেধা ও পাহাড়প্রমাণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। যুগোপযোগী সমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রয়োজনানুগ ধারণার সঙ্গে সঙ্গে, সিরাত, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যে ছিল তাঁর অবাধ গতি ও শক্তি। শাব্দিক জ্ঞানচর্চায় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি-চেতনায় তিনি ছিলেন আকাবিরে উম্মাহর 'মুখপাত্র'। যুগব্যাধির যুগান্তকারী চিকিৎসায়, দুর্যোগের দুর্বার সংস্কারসাধনায় তিনি ছিলেন 'যুগদর্শী ও অন্তদর্শী'। যুগের সবচেয়ে বড় ফেতনা– জড়বাদী পাশ্চাত্য-সভ্যতার আগ্রাসন, জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে ইসলামি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের পশ্চাদপসরণ এক কথায় মুসলিম-বিশ্বের চিন্তানৈতিক ইরতিদাদের (ধর্মত্যাগের) মোকাবেলায় সিদ্দিকি ভূমিকাপালনে তিনি ছিলেন অভিভাবক ও অধিনায়ক। তাই 'মানবদুর্ভিক্ষের' বিংশ শতাব্দীতে 'সংস্কারসাধকের' শিরোপা তাকেই শোভে। ইসলাম ও আধুনিকতাকে যখন মনে করা হচ্ছিল দুই মেরুবাসী, তখনই 'উপযোগী নতুনের ও উপকারী প্রাচীনের সমন্বয়-সমাবেশ'-এর আদর্শস্নাত স্লোগান তুলে উভয়ের মাঝে রচনা করলেন শেকড়দৃঢ় সমীহ ও সেতুবন্ধন। তাই তিনি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের অন্ত আলোড়িত করতে সক্ষম হয়েছেন আদর ও উদারতায়। তাঁর শীলিত সত্তায় একই সঙ্গে সমাবেশ ঘটেছিল চিন্তার সঙ্গে চেষ্টার, চেষ্টার সঙ্গে নিষ্ঠার, বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সংকল্পের সঙ্গে উদ্যমের, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যোগের। মুখের কথা দিয়ে, বুকের ব্যথা দিয়ে, কলমের কালি দিয়ে, কলবের অনুভূতি দিয়ে জাতিকে পথ দেখিয়েছেন। চিন্তার ফসল দিয়ে, চেতনার সম্পদ দিয়ে, আত্মার উত্তাপ দিয়ে, নিষ্ঠার নির্যাস দিয়ে উম্মাহকে দীপিত-উদ্দীপিত করেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শুরু করে 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামির' (Muslim World League) মতো উম্মাহর দিকনিয়ন্ত্রণকারী বহু সংঘের ও প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। সেই

ইকবালকাব্যের অনুবাদে

ফররুখের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য

এক

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বাংলাসাহিত্যের একজন মৌলিক প্রতিভাধর ও স্বভাবকবি হিসেবে তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে সন্তোষজনক আলোচনা হলেও তাঁর প্রতিভার একটি উজ্জ্বল দিক বরাবরই উপেক্ষিত ও অনালোচিত থেকে গেছে। ফররুখ-প্রতিভার সে উজ্জ্বলতম দিকটি হলো তাঁর অনুবাদ-প্রতিভা। অন্যান্য সমালোচক ও গবেষকরা তো বটেই, ফররুখ-অনুরাগী সমালোচক ও গবেষকগণও এ-দিকটি নির্মমভাবে এড়িয়ে গেছেন? সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, স্বকালের শ্রেষ্ঠ সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), যিনি ফররুখ-অনুরাগী সমালোচক ও গবেষকদেরও অন্যতম, তিনিও ফররুখের অনুবাদ-প্রতিভা সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা করেন নি। ফররুখকে নিয়ে তাঁর গভীরাশ্রয়ী গবেষণাগ্রন্থ 'ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য'-এ ফররুখের গ্রন্থপঞ্জির তালিকায় 'কুরআন-মঞ্জুষা' ও 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা'র নামটুকু শুধু উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর অনুবাদ-প্রতিভা বা শক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কোনো আলোচনাই করেন নি। ব্যতিক্রম শুধু মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌। তিনি 'বাংলাকাব্যে ফররুখ আহমদ : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ' গ্রন্থে ফররুখের অনুবাদ নিয়ে দীর্ঘ দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন : 'আল-কুরআনের অনুবাদে ফররুখ আহমদের অবদান' (পৃ. ২৮১-২৯২) এবং 'ইকবাল-কাব্যের অনুবাদক ফররুখ' (পৃ. ২৯৩-৩০৩)। এ ছাড়াও তিনি ফররুখ-অনূদিত 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা'র ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকায়ও ফররুখের অনুবাদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন।

এ-বিষয়টিতে সমালোচকদের অবহেলা ও উপেক্ষায় আমাদের বিস্ময়ের কারণ হলো, ফররুখের অনুবাদ গুণে-নৈপুণ্যে, মূলানুগতায়-বিশ্বস্ততায়, বিদেশি রূপকল্পের দেশি রূপায়নে, ভিনভাষী চিত্রকল্পের নিজভাষিক চিত্রায়ণে মৌলিক সৃষ্টির মহিমায় মণ্ডিত। শব্দে-ছন্দে, মূলের মর্ম-মেজাজরূপায়ণে, বলার ভঙ্গিতে-সঙ্গীতে, উপমা-রূপকের স্বদেশিকরণে, চিত্রকল্পের নিজপরিবেশীয় পরিবেশনে তাঁর অনূদিত কবিতা যেন তাঁরই রচিত কবিতা। মৌলিক রচনার মতোই গাঢ়বদ্ধ ও প্রাণবান। অনুবাদপনার ফেনায়িত জলাশয়ে পরিণত হয় নি তাঁর অনূদিত কবিতাসমগ্র।

বাংলাদেশে ইকবাল-চর্চা

এক

জীবদ্দশায় সর্বোচ্চ সুখ্যাতি দেখে যাওয়া সকল বড় ব্যক্তির হয় না। কিছু ব্যতিক্রম থাকেন। তাঁদের একজন দার্শনিক কবি ইকবাল। তিনি কাব্যসাধনার সুখ্যাতি জীবদ্দশায়ই অবলোকন করে গেছেন।

১৯০৮ সালে পাশ্চাত্যের প্রাণকেন্দ্র লন্ডনে ডক্টরেট ডিগ্রীর থিসিস গ্রন্থ Devlopment of Metaphysics in persia এবং ১৯২০ সালে 'আসরারে খুদি' কাব্যের ইংরেজি আনুবাদ Secrets of self প্রকাশিত হলে বিশ্বের খ্যাতনামা জ্ঞানী-গুণী, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর কালজয়ী প্রতিভার পরিচিতি খুদিত হয়ে যায়। খ্যাতির সীমানা বিস্তৃত হয় আদিগন্তজুড়ে।

ইকবাল তখন বিশ্বজুড়ে এক অনন্য আলোচিত-সমালোচিত ব্যক্তিত্ব। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেও তাঁর আলোচনার আলো এসে পৌঁছা স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই। বাংলাদেশের জ্ঞানী-গুণী মহলে ইকবালের কাব্য-সাধনার ছোঁয়া দুর্দান্তভাবে লেগেছে তখন।

সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশে ইকবালচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরতে চাই।

দুই

ইকবালের বেশ কয়েকটি গন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য দু-একটি ছাড়া অধিকাংশ অনুবাদগ্রন্থই পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নানা কারণে-অকারণে ইকবালকাব্যের খুব একটা আলোচনা হয় নি। সে এক দীর্ঘ প্রসঙ্গ।

বিগত কয়েক দশক থেকে পুনরায় ইকবাল-প্রতিভার মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। এটা খুবই শুভলক্ষণ জাতির জন্য, সাহিত্যের জন্য, বিশ্বমানবতার জন্য।

১৯৮১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা' (ফররুখ আহমদ অনূদিত) বইটি স্বাধীনতা-উত্তর প্রকাশিত ইকবালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে ইসলামিয়া লাইব্রেরি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া' বইটির পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকবার।

ইকবালের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৮৭৭	**৯ নভেম্বর মোতাবেক ৩ জিলকাদ ১২৯৪ হিজরি সনে তৎকালীন ভারতবর্ষের (বর্তমান পাকিস্তান) শিয়ালকোট শহরে ইকবালের জন্ম।**
১৮৮৩	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য স্ক্যাচ মিশন স্কুলে ভর্তি।
১৮৮৮	প্রাইমারি স্কুল পাস।
১৮৯১	স্ক্যাচ মিশন হাই স্কুল শিয়ালকোট থেকে 'মডেল স্কুল পরীক্ষা' পাস।
১৮৯৩	ম্যাট্রিক পাস করেন এবং নিয়তান্ত্রিক কাব্যচর্চার সূচনা হয়।
১৮৯৫	শিয়ালকোট স্ক্যাচ মিশন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে বি.এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন।
১৮৯৬	জীবনের সর্বপ্রথম কবিতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
১৮৯৭	লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বি.এ. পাস এবং জামালউদ্দিন পুরস্কারপ্রাপ্তি।
১৮৯৯	লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে এম.এ. (দর্শন) পাস করেন এবং লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবি বিভাগে অধ্যাপনা শুরু।
১৯০০	লাহোর আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভায় 'নালায়ে ইয়াতিম' শীর্ষক কবিতা আবৃত্তি।
১৯০১	এপ্রিল মাসে লাহোরের সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু পত্রিকা মাখজান-এ হিমালা কবিতা প্রকাশিত হয়।
১৯০২	লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে ছয় মাসের জন্য ইংরেজি শিক্ষক নিযুক্ত হন।
১৯০৩	লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান।
১৯০৫	দিল্লি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার জিয়ারত এবং পি.এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করার জন্য জার্মানি গমন।

১৯০৭	জার্মানির মিউনিখ ইউনিভার্সিটি থেকে পি.এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ।
	লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে আরবি বিভাগে অধ্যাপনা।
১৯০৮	বার-এট-ল (লন্ডন) ডিগ্রী লাভ এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ২২শে অক্টোবর থেকে লাহোরে ব্যারিস্টারি শুরু করেন।
১৯১০	সরদার বেগম (জাভেদ ইকবালের মাতা)-এর সঙ্গে ইকবালের বিয়ে হয়। কিন্তু উঠিয়ে নেওয়া হয় ১৯১৩ সালে।
১৯১১	লাহোর সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসা করার অভিপ্রায়ে আবেদনপত্র পেশ করেন। এ বছরই তিনি তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাব্য 'শেকওয়া' লাহোর আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলামের সভায় আবৃত্তি করেন। এ ছাড়া তিনি লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের (দর্শন বিভাগে) অধ্যাপনাও করতেন।
১৯১২	লাহোর আনারকলিতে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সভা ও কবিতানুষ্ঠানে যোগদান শুরু করেন।
১৯১৩	'তারিখে হিন্দ' রচনা করেন।
১৯১৪	৯ই নভেম্বর শিয়ালকোটে তাঁর আম্মাজান ইমাম বিবি ইন্তেকাল করেন।
১৯২০	কাশ্মির শ্রীনগর সফর।
১৯২২	বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন।
১৯২৩	১ম ও ৮ম শ্রেণির ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।
১৯২৪-১৯২৮	পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।
১৯২৫	লাহোর ইসলামিয়া কলেজে 'ইসলাম ও জিহাদ' বিষয়ে ভাষণ দান।
১৯২৮	মাদ্রাজ, হায়দারাবাদ ও মহিশুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণক্রমে বক্তৃতা প্রদান।
১৯৩০	আব্বাজান শেখ নুর মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেন। অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।
১৯৩১	ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত 'মুতামারি আলমে ইসলামি' (ইসলামি বিশ্ব